# যখন কৃষিপণ্য ব্যবসা বা এগ্রিবিজনেস প্রসারিত হচ্ছে, তখন ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় চাষের স্থিতিশীল পদ্ধতি নিয়ে কে আলোচনা করছে?

নিখিত কুমার আগরওয়াল

২০ ডিসেম্বর, ২০২১

যে তিনটি কৃষি আইন ভারতের কৃষি সেক্টরের সংস্কার সাধন করবে বলে মোদী সরকারের দাবি ছিল, ২০২০ সালে ২৬ নভেম্বর থেকে দিল্লির সীমান্তে কৃষকরা সেগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েক দিন আগেই তাঁরা তাঁদের এই বিক্ষোভ অবস্থান স্থগিত রেখেছেন। সংসদে চলতে থাকা শীতকালীন অধিবেশনে প্রত্যাহার করে নেওয়া এই তিনটি আইনের একত্রিত উদ্দেশ্য ছিল এই দেশে কৃষি সংক্রান্ত পণ্যের ক্রয়, বিক্রয় ও মজুদ বিষয়ক সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা এবং লিখিত চুক্তি নির্ভর ঠিকা চাষের ব্যবস্থা চালু করা। কৃষির সঙ্গে জড়িত বেসরকারি ব্যবসাগুলি যেমন যুক্তি দেখিয়েছে, এই তিনটি আইনের অন্তর্নিহিত ভিত্তি ছিল, ব্যবহারযোগ্য সম্পদের সমান ভাগে বন্টন বা এফিশিয়েন্সি গেইন কৃষকদের আয়ে প্রতিফলিত হবে – এই আশায় কৃষি-খাদ্য শৃঙ্খলে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগ সম্ভব করা। যখন আইনগুলি প্রত্যাহারের পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার প্রত্যাহারের মত বিক্ষোভকারীদের আরও কিছু দাবি মেনে নেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাঁদের অন্যান্য দাবির বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি হন, একমাত্র তখনই কৃষকরা তাঁদের প্রতিবাদ অবস্থান প্রত্যাহার করেন। এগুলির মধ্যে সব চেয়ে বিতর্কিত দাবিটি ছিল, কৃষি সম্পর্কিত পণ্যের জন্য ন্যূনতম সহায়তা মূল্য বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসেস (এমএসপিস) অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ঘোষিত ন্যূনতম মূল্য যার প্রয়োগ কৃষকদের জন্য লাভজনক বলে মনে করা হয়, সে সংক্রান্ত একটি আইন বলবত করার প্রতিশ্রুতি।

এই বিতর্কিত কৃষি আইনগুলির ভালো দিক ও মন্দ দিক নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের কৃষিকেন্দ্রিক কাজকর্মকে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কৃষকদের জন্য স্থিতিশীল হতে হলে এই দেশের কৃষিকে কোন দিকে এগোতে হবে সে বিষয়ে অনেক কমই আলোচনা হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে চর্চা হওয়া অত্যন্ত জরুরি, কারণ এই কৃষি আইনগুলি শুধু ভারতের কৃষিকাজের নতুন রূপায়নের জন্যই প্রণয়ন হচ্ছে না। বরং, এই আইনগুলি প্রণয়নের কিছু বছর আগে থেকেই কৃষির বিষয়টি কৃষিপণ্য ব্যবসা বা এগ্রিবিজনেসের পরিচালনায় উন্নয়নের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করছে। এই কৃষি আইনগুলি উদ্দেশ্য কেবল সেই পরিবর্তনের গতি দ্রুততর করা।

বর্তমানে ভারতে স্টার্ট-আপের সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট হয় যে, গত দশকেই ভারতের অভিমুখ প্রযুক্তিকেন্দ্রিক শিল্পোদ্যোগভিত্তিক বা টেকনো-অন্ত্রোপ্রনিওরিয়াল উন্নয়নের দিকে ঘুরে যাওয়া শুরু হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষিপণ্য ব্যবসার অধীনে উন্নয়নের বিষয়টিকে তারই সম্প্রসারণ হিসাবে দেখা যায়। থিঙ্কএজি নামের যে মঞ্চটি এগ্রি-টেক স্টার্ট-আপে বিনিয়োগের সম্পর্কে প্রচার করে তাদের মতে, ভারতের নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষিবিষয়ক ব্যবসাগুলি ২০১৮ ও ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলারের মূলধন পেয়েছে যা এখনও পর্যন্ত একটি রেকর্ড। এই মূলধনের অধিকাংশই এসেছে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে। বর্তমানে ভারতে ছয়শর বেশি এগ্রি-টেক স্টার্ট-আপ আছে যা গোটা দেশের প্রায় এক কোটি চল্লিশ লাখ কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে চলেছে। কোভিড-19 অতিমারীর কারণে কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফ থেকে বাড়ি থেকে একেবারেই না বেরনোর যে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল তার জন্য

কৃষকদের কাজকর্ম ও চলাফেরা কমে যায়। এর ফলে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কৃষিবিষয়ক জিনিষপত্র সরাসরি সংগ্রহ করা ও পৌঁছে দেওয়ার মত নানা বিষয়ে এগ্রি-টেক ব্যবসাগুলির কর্মকাণ্ডের উপর তাঁদের নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। এই ব্যবসাগুলি নানা নতুন বাজারে নিজেদের বৃদ্ধি ও প্রসার বাড়াতে এই জাতীয় কার্যকলাপকে অর্থকরীভাবে ব্যবহার করে।

প্রশ্ন হল, এই কৃষিপণ্য ব্যবসা নির্ভর উন্নয়নের আদর্শ কি ভারতের কৃষি ও তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কোন উপকারে আসবে? কারখানাজাত জিনিসের সাহায্যে যান্ত্রিক উপায়ে কৃষিকাজ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চাষাবাদ নিয়ে বহু দশকের যে পড়াশুনো ও গবেষণা তার যুক্তি অনুযায়ী, কৃষিনির্ভর ভবিষ্যত সম্পর্কের যে কোন ধারণাকেই পরিবেশের ভারসাম্যকে কেন্দ্র করে এগোতে হবে। এর অর্থ, কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি, প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যবহার। ভারতের কৃষির ক্ষেত্রে এই কৃষিপণ্য ব্যবসার পরিচালনায় উন্নয়নের এই আদর্শ কি চাষের জন্য ভারসাম্য বজায় রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের বিষয়টির প্রচার করছে?

২০২১ সালে আমার গবেষণা চলাকালীন যে এগ্রি-টেক শিল্পোদ্যোগী আর বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তাঁরা কৃষি সেক্টরকে ভারতের অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টর থেকে আলাদাভাবেই দেখছিলেন। এই পার্থক্য করা হয়েছে কেবলমাত্র কৃষির গ্রামীণ অবস্থান, তুলনামূলকভাবে কম উন্নত পরিকাঠামো (আজকাল সুলভ ডেটার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ), তাঁদের পণ্য ও পরিষেবাকে অর্থকরী করে তোলার উপায়ের অভাবের প্রেক্ষিতেই নয়। এই আলাদা করে দেখার পিছনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ কৃষি সেক্টরের পরিবেশনির্ভর ভিত্তি। যেমন, বীজ পোঁতার সময় থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত শস্যের জীবনচক্র স্বল্পস্থায়ী, যেহেতু অধিকাংশ কৃষিজাত পণ্যের ব্যবহারযোগ্যতার মেয়াদ সীমিত, তাই সেগুলিকে বেশি দূরে কোথাও চালান দেওয়া সম্ভব হয় না এবং দেশে চাষবাসের পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য তৎপরতা বাড়তে চলেছে। তা সত্ত্বেও, এই উঠতি এগ্রি-টেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অধিকাংশই কৃষি বিষয়ক পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া, ফসল নিয়ে রোজকার কাজকর্মের বদলে কৃষিজাত পণ্যের সঙ্গে বাজারের যোগাযোগ নিশ্চিত করা এবং কৃষিকাজের স্থায়িত্ব নিরাপদ করার মত কাজ করছে। এঁরা যখন কৃষিতে ভারসাম্যের কথা বলেন, তখন তাঁরা তাকে এই নানা ধরনের হস্তক্ষেপের সরাসরি প্রভাব হিসাবে না দেখে বরং তার পরোক্ষ ফলাফল হিসাবেই দেখেন। আমার গবেষণার সময় এগ্রি-টেকের একজন লগ্নিকারী আমাকে জানান, "এই সেক্টরে যে ধরনের উদ্ভাবন চোখে পড়ে এই ভারসাম্য অবশ্যই তার ফলাফল। কিন্তু আমার মতে, সেটাই আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং উপরি পাওনা…শিল্পোদ্যোগীরা এমন ব্যবসা গড়ে তুলতে চান যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে এবং বিনিয়োগকারীরা চান লাভ। কিন্তু আমি খোলাখুলিই বলছি, কেউই শুধুই প্রাকৃতিক ভারসাম্যের স্বার্থে এই সেক্টরে বিনিয়োগ করছেন না। আমার মনে হয় সেটার জন্য যা দরকার তা হল একদম অন্য ধরনের পুঁজি। ভিসি বা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থাৎ ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন অথবা ব্যক্তিগত মূলধন যা সাত বছরে ত্রিশ শতাংশ আইআরআর চায় এমন পুঁজি নয়। যদি এই সেক্টর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রাখার উপায় বের করে তাহলে ভালো। আর যদি নাও করে, তাহলেও ঠিক আছে।"

এছাড়াও, অন্যান্য জায়গার (যেমন, ইউনাইটেড স্টেটস) প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের হস্তক্ষেপের ফলে কৃষিকাজে ডিজিটাইজেশানের বিকাশ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলির মতে, বর্তমানে কৃষির ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি ও পদ্ধতিগত বদল এসেছে সেগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান তো করবেই না বরং সেগুলি তীব্রতর হয়ে দেখা দেবে। তাছাড়া, এর ফলে "জমি দখলের" সঙ্গে সঙ্গে "তথ্য ছিনতাই"-এর মত ঘটনাও শুরু হতে পারে। এই ধরনের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের বিষয়টিকে সক্রিয়ভাবে প্রচার করে চলেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কৃষিতে

ডিজিটাইজেশানকে জনপ্রিয় করতে কৃষি মন্ত্রকের তরফ থেকে ইন্ডিয়া ডিজিটাল ইকোসিস্টেম অফ এগ্রিকালচার (আইডিয়া) নামে একটি খসড়া কাঠামো বের করেছে। প্রশ্ন হল, কেন?

প্রথমত, প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পোদ্যোগের সমর্থকরা প্রযুক্তিগত ভবিষ্যবাদ ও নব্য উদারনীতির মতাদর্শ দ্বারা চালিত। আমার গবেষণার সময়ই, আমি সব সময়ই নীতিনির্ধারক এবং প্রভাবশালী কৃষি-সংক্রান্ত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একটা স্পষ্ট হতাশা লক্ষ্য করেছি। এর কারণ, ১৯৯০-এর দশকে শুরু হওয়া কৃষির আজও অসম্পূর্ণ উদারীকরণ প্রক্রিয়া। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রমেশ চাঁদ, নীতি আয়োগের সঙ্গে যুক্ত একজন কৃষি-অর্থনীতিবিদ, বলেন ১৯৯১ সালের সংশোধনের বিষয়সূচীতে কৃষিকে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছিল। কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটা "দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন"। চাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, এর জন্য দরকার "বিজ্ঞান নির্ভর প্রযুক্তির অগ্রগতি, ফসল কাটার আগের এবং পরের দুই পর্যায়েই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আরও বেশি জড়িত থাকা, উৎপাদিত পণ্যের জন্য উদার বাজার, জমি ইজারার জন্য সক্রিয় বাজার এবং দক্ষতার উপর আরও বেশি মনোযোগ।" আইডিয়া নথিটি আরও দাবি করে যে, ভারতের কৃষিকাজকে "দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার উচ্চতর স্তরে" তুলতে হলে ডিজিটাইজেশান অত্যন্ত প্রয়োজন। এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হল, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে  দক্ষতার অভাব আছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আরও বেশি অংশগ্রহণ, রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উন্নয়ন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির পক্ষেই সম্ভব কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষতা আনা। তবে, মুক্ত বাজার কেন কৃষির ক্ষেত্রে কাজ করে না তার যে আরও অসংখ্য কারণ আছে তা তাঁরা স্বীকার করেন না। সেই কারণগুলির মধ্যে একটি হল, গ্লোবাল নর্থের উন্নত দেশগুলিতে চাষের কাজের জন্য প্রচুর ভর্তুকি দেওয়া হয়, যার ফলে কৃষির আন্তর্জাতিক বাজার একপেশে হয়ে পড়ে। এছাড়া, অতীতের প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা গেছে। মাটির গুণমান কমে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়া এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার মত সমস্যাগুলি আজ ভারতের সামনেও এসে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষির উন্নয়নকে টেলিকম্যুনিকেশান এবং স্পেসের মত সেক্টরের সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে বোঝার উপর একটা ঝোঁক দেখা যায়। ডিজিটালাইজেশানের ফলে অন্যান্য সেক্টরে যেমন পরিবর্তন এসেছে, ধরেই নেওয়া হয় কৃষিক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই ঘটবে। তবে, এগ্রি-টেকের সমর্থকরা ক্রমশ আরও বেশি করে কৃষির পরিবেশ নির্ভর ভিত্তিকে স্বীকৃতি দিলেও কৃষির জন্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকেন্দ্রিক পুরুষালী পন্থা গ্রহণের ঘটনাটি ঘটেই চলেছে। এই সমাধানগুলি অভাবনীয়ভাবে বাস্তবের দুনিয়া বদলে দিতে পারে। এছাড়াও, বিশ্ব জুড়ে কারখানাজাত জিনিস ব্যবহার করে যান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত কৃষিকাজের ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে এর থেকে কী ধরনের অনিচ্ছাকৃত পরিণতি দেখা দিতে পারে। এই জাতীয় ফলাফলের কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না।

পরিশেষে, অন্ধ্রপ্রদেশের একটি সমীক্ষা থেকে যেমন দেখা গেছে, এই প্রভাবশালী কলকারখানা ও সামাজিক-প্রযুক্তি নির্ভর সরকার উন্নয়নের যে কোনও বিকল্প উপলব্ধিকেই (যেমন, "প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে চাষ") তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে। একটি সাম্প্রতিক গবষণায় সেমন দেখা গেছে, অন্ধ্রপ্রদেশে আরও টেঁকসই উপায়ে চাষ করার পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছিল যা ছিল এ বিষয়ে বিশ্বের বৃহত্তম প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে একটি। এই পদক্ষেপটিকে "লক্ষ্য করে জাতীয় কৃষিবিজ্ঞান পরিষৎ বা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কারখানাজাত জিনিসের (বীজ, সার, কীটনাশক) যোগানদাররা সমস্বরে সক্রিয় সমালোচনা করতে শুরু করেন।" তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, এই প্রচেষ্টা একটি "পশ্চাদমুখী পন্থা" যার ফলে দেশে খাদ্য সুরক্ষা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। প্রযুক্তি আর অগ্রগতির উপর নির্ভরশীলতার কারণে যে আবেগপূর্ণ পরিকাঠামো তৈরি হয় তার বিরোধিতা করার জন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল কৃষিকাজের মত বিকল্প। কৃষিকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্রের অনেকের কাছেই এই বিকল্প আবার বিজ্ঞান ও অগ্রগতির পরিপন্থী। তবে, যদি স্থিতিশীল কৃষি নির্ভর ভবিষ্যত নিয়ে বিকল্প ভাবনাচিন্তায় বিনিয়োগ না করা হয় তাহলে তা কি ভাবে সম্ভব হবে সেটি অমীমাংসিতই থেকে

যায়। ভারতের কৃষিব্যবস্থা নিয়ে সহলেখক হিসাবে আমাদের লেখা একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এর একটি সম্ভাব্য রাস্তা হল, দেশের কৃষিব্যবস্থাকে সার্থকভাবে ঢেলে সাজাতে কৃষকরা তাঁদের ন্যূনতম মূল্যের দাবির সঙ্গে কৃষির এই বিকল্প ভবিষ্যতের বিষয়টি জুড়ে নিতে পারেন।

*নিখিত কুমার আগরওয়াল ইউসিএলএ-র নৃতত্ত্বের ডক্টরাল ক্যান্ডিডেট*